



আযাদী আন্দোলন

হাসান জামান



রুশবিপ্লব এর সঙ্গে সঙ্গেই ইদিল-ইউরাল ও ক্রিমিয়ার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯১৮ সালের মে মাসে পশ্চিম তুর্কিস্তানের সঙ্গে উত্তর ককেশিয়া ও আজারবাইজানও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রুশ সরকার আপাতত এ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু শেষটায় এ ওয়াদা রক্ষিত হয়নি।

মুসলমানরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান ও সর্বময় বিচারক। ফলে তাদের জীবনে এমন এক মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় এর জন্ম হয় যা দুনিয়ার বিপদ-আপদ, ঘৃণা-বিতৃষ্ণা কিছুতেই বিনষ্ট করতে পারে না। এ আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বাহক রাশিয়া ও চীন মুসলিম সংস্কৃতি, স্বাভাবিক ও সংহতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

কিন্তু সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাসে আবদ্ধ মুসলমানরাও মুখ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারা যথাসম্ভব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য যে কেবল অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা, তাই নয়, নিজস্ব সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে শান্তি-সমৃদ্ধিময় নতুন সমাজ গঠনের জন্যেও তাঁরা বজ্রকঠোর শপথ নিয়েছেন। তাঁদের এই আযাদী আন্দোলন 'মুজাহিদ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

১৯১৭ সালে অক্টোবর আন্দোলনের সময় রাশিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল আট কোটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আলবেনিয়ায় আট লক্ষ, যুগোস্লাভিয়ার সতের লক্ষ আশি হাজার, বুলগেরিয়ায় সাত লক্ষ আশি হাজার ও চীনের নানা জায়গায় অবস্থিত (বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম দিকে) আট কোটি মুসলমান সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিস্ট ড্রাগনের মুখে গিয়ে পড়েছেন।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর গণভোট ও জনমত গ্রহণ না করেই লাল ফৌজ ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীগণ তাস্কেস্তে প্রবেশ করে তথাকথিত স্বাধীন তুর্কিস্তান গঠন করে। "Dawn over Samarkand"-এর কমিউনিস্ট লেখক Joshua Kunitz পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মধ্য-এশিয়ার কতিপয় রেলশ্রমিক ও বলশেভিক তুর্কিস্তানের সোভিয়েত নেতা কোলেসেভের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠন করে। তাস্কেস্ত ছাড়া কোগান, চারদজুই কোকন্দ ও আরও অনেক জায়গাতেই রুশ-নেতৃত্বদ, রুশ শ্রমিক ও কৃষকগণ অবস্থান করছিলো। জারের আমলেও এরা অস্ত্রশস্ত্র ও সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে জার সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলমানদের উপর আধিপত্য করতো। রুশ বিপ্লবের পর এরাই আবার কমিউনিস্টদের সাথে একজোট হয়ে মুসলিম নির্যাতন শুরু করে। মধ্য এশিয়ার সাধারণ মুসলমানরা এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করেনি। তাই বিপ্লবের পর মুসলমানরা একই প্রভুর আওতায় রয়ে গেলেন ; কিন্তু তা ঘটলো নতুন মার্কসীয় দর্শন ও শ্রেণী সংঘর্ষের নামে।

অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীকে তুর্কিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা জোরে-সোরে চালিয়ে যাওয়া হল। বলশেভিক সৈন্যগণ তুর্কিস্তান আক্রমণ করে ঘরবাড়ি জমি ও শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ভীতির রাজত্বে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অরাজকতা সর্বব্যাপী হাহাকার উঠলো, তাতে আট হাজার মুসলমানের প্রাণহানি হয়। মস্কোর দশম সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রদত্ত এক কমিটির রিপোর্টে এ

কথা স্বীকার করা হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে কমিউনিস্টগণ মুসলিম স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেবার অপচেষ্টা চালিয়েছে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের নামে তাঁরা মুসলমানদেরকে উজবেক, তাজিক, তারকমান, কাজাক ও কিরঘিজ - এই সব দলে বিভক্ত করে দেয়। পশ্চিম তুর্কিস্তানকে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরঘিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও কারাকালপাকে (স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ), ইদেল-ইউরালকে তাতার, বাশকারদ মুরদার (স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ) ও আরও দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে। এমনি করে আযরবাইজানকে আযরবাইজান রাষ্ট্র, নাকচিবান, আবখায়ইয়া ও দক্ষিণ-ওসেটিন - এই চারটি অংশে ও ট্রান্স ককেশিয়াকে দাঘিস্তান, চিকেন, ইংগুশ, ওসেটিয়া, কাবারতে বলকার, কারাচে, চেরকেম এজ, কালমুক ও গ্রোযনী (স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ) মায়কেব ও কারাদেনিয - এই দশভাগে ভাগ করা হয়। এই সব উপরাষ্ট্র বা অঞ্চলগুলো রাশিয়ার চর ও আমলাতন্ত্রের অধীনে পরিচালিত হয় ও শতকরা বাহাত্তরজন থেকে আশিজন সরকারি চাকুরিয়াকে খোদ রাশিয়া থেকে এনে বসানো হয়।

তুর্কিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা চোকাইয়েভ বলেনঃ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা কমিউনিস্টদের আসল উদ্দেশ্য নয় - তারা চায় তুর্কিস্তানের জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করে দিতে। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম অঞ্চলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য কমিউনিস্টরা ঠিক করে যে, মধ্য এশিয়ায় তুলা ছাড়া আর কোন ফসল উৎপন্ন করতে দেয়া হবে না। অন্যান্য শস্য ও খাদ্যদ্রব্য (আলু ও কপি) এ এলাকায় রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আনা হবে। বলশেভিক মতবাদ প্রচারে তুলা উৎপাদনের চাবিকাঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তৃতীয়তঃ ১৯২৮ সালে জোর করে আরবি হরফের জায়গায় রোমান ও পরে সিরিলিক (রুশ) প্রবর্তন করে কমিউনিস্টরা মুসলমানদেরকে গোটা ইসলামি দুনিয়া থেকে এবং ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। ১৯৩৮ সালে রাশিয়ার সর্বত্র রুশভাষা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়।

গোঁড়া থেকেই এর বিরুদ্ধে তুর্কিস্তানের বাসমাকি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বাসমাকী সৈন্যরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়া যান। শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

তুর্কিস্তানের মত বাশকিরিয়াতে একই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। ১৯১৮ সালে স্বাতন্ত্র্যের ওপর ভিত্তি করে এখানকার অধিবাসীরা নিজস্ব সরকার গঠন করে। ১৯১৯ সালের শেষদিকে কমিউনিস্টরা বাশকিরীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। তবুও এঁরা নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯২১ সালে দুইদুবার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এতে অগণিত বাশকির শহীদ হন। ১৮৯৭ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, বাশকিরীয়দের মোট সংখ্যা ছিল তেত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার তিনশ তেষটি। ১৯২৬ সালে কমে গিয়ে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ছ' লক্ষে। বাশকির ও তাতার জাতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় ও এগুলোকে □জাতীয় জিলা□ ও □জাতীয় অঞ্চল□ বলে নামকরণ করার পর এগুলোকে সম্পূর্ণ করা হয়। দাগিস্তানীরাও ১৯২০ সাল থেকে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছেন। বিচ্ছিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা বার বার বিরোধিতা করেছেন। ১৯২০ সালে যখন রাশিয়া দাগিস্তান অধিকার করে, তখন স্তালিন দাগিস্তানের অধিবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, শরীয়ত আইন রক্ষা করা হবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দাগিস্তানের সীমানা ক্রমশঃ সংকীর্ণ করে আনা হয়। তেরেক নদীর উত্তর দিকটা গ্রোযনী এলাকার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। আর ১৯৫০ সালে শরীয়ত আইন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়।

রুশবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ইদেল-ইউরাল ও ক্রিমিয়ার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯১৮ সালের মে মাসে পশ্চিম তুর্কিস্তানের সঙ্গে সঙ্গে ককেশিয়া ও আযরবাইজানও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাশিয়া আপাতত এ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু শেষটায় আর এ ওয়াদা রক্ষিত হয়নি। শীঘ্রই মুসলমানরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।

বাইরের দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনতে বাধা দেয়ার জন্যই এ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। জারের সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় নতুন বলশেভিক সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হল। অতঃপর দুইবছর ধরে মুসলমানরা সংগ্রাম চালিয়ে যান। যাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিঞ্চিৎ ভালো ছিল তাঁরা ১৯২৫ সাল অবধি জেহাদ চালিয়ে যান। মুসলমানদের তরফ থেকে গুপ্ত রাজনৈতিক কমিটি অনেকদিন ধরে প্রতিরোধ-আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা ভীতি ও ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন জাদীদ বা আধুনিকদল। ১৯০৫ সালে (রুশ-জাপান যুদ্ধ) ভল্গা, ক্রিমিয়া, ও ককেশাসে জাদীদ দল সংগঠিত হয় ও মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান ও বোখরার বুদ্ধিজীবীদেরকেও আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। সমগ্র মুসলিম এলাকায় এই গুপ্ত-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ও ১৯০৮ সালের তুর্কী ও ইরাকী বিপ্লব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

অক্টোবর-বিপ্লবের (১৯১৭) পাঁচ সপ্তাহ পর জাতীয়তাবাদী [জাদীদ] মুসলিমদের নেতৃত্বে কোকন্দে চতুর্থ নিখিল তুর্কিস্তান মুসলিম কংগ্রেস তুর্কিস্তান গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুস্তফা চোকাই এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীগণ একযোগে ইসলামি সমাজ গঠনের কাজে লেগে যান। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক ও শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অনেক দূরদর্শী ধর্মীয় নেতাও এ আন্দোলনে শরীক হন। আশকাবাদের রুশ-সৈন্য ও কমিউনিস্ট তাঁবেদার শ্রমিকগণ যখন [তুর্কমেনীয়] সোভিয়েত-সরকার গঠন করে, তখন তুর্কমেনিস্তানের প্রতিটি মানুষ এই বেআইনী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে রুশ ক্রীড়ানক এই সরকার বিলুপ্ত হয় ও স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। ১৫ জুলাই নাজন সোভিয়েত নেতা এঁদের হাতে প্রাণ হারায়। তুর্কিস্তান গণ-আন্দোলনের গুপ্ত কমিটি সমগ্র মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলো, কিন্তু বোখারার আমীর সাইদ আলম খানের বিশ্বাসঘাতকার ফলে কমিউনিস্ট সৈন্যগণ জাদীদদের উৎখাত করে দেয়। তিরিশজন জাদীদকে জেলে পুরে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৫০ ঘা বেত মারার ফলে মির্জা নাসরুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। জাদীদনেতা ফয়জুল্লাহ [স্মৃতিকথায়] এ নিষ্পেষণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

বোখারার অধিবাসীগণ ৩৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে দেশ ও ধর্ম রক্ষার্থে এগিয়ে আসেন। কোলেসভের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশ সৈন্যকে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে আক্রমণ করেন। প্রথম আক্রমণের পর ১৯২০ সালের ৩১ আগস্ট রুশ সৈন্য আবার বোখারা আক্রমণ করে; ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলে। মুসলিম নরনারী ও শিশুদের রক্তে বোখারা রঞ্জিত হলো। অতঃপর কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিজয়কেতন উড়তে থাকে। মুসলিম শ্রমিক ও কৃষকগণ এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ও পূর্বকথিত বাসমাকী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে ফারগানা কেন্দ্রে গেরিলা বাহিনী গঠন করে এঁরা কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। আমীন বেগ অক্টোবর মাসে ফারগানার স্বাধীন মুসলিম সরকার গঠন করে। এ আন্দোলনের পেছনে মুহাম্মাদ খোদযাইয়েভ, উসমান খোদযাইয়েভ আরেযভ প্রমুখ নেতা ছিলেন। উসমান প্রথমে কমিউনিস্ট ছিলেন, কিন্তু পরে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আনোয়ার পাশার দলে যোগদান করেন। ১৪ হাজার লোক আনোয়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তুর্কিস্তানের ফয়জুল্লাহ খাজা, আকমল ইকরাম, দৌলত মনবী, সুলতান ইনসান, আব্দুল্লাহ জব্বার খাসানভ (প্রাক্তন কমিউনিস্ট), কারী আব্দুল্লাহ (প্রাক্তন কমিউনিস্ট), নুর কাল বাতীর, দানিয়েল বেগ, ওল্লিকবাশী ও ইব্রাহীম বেগ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন।

আযরবাইজানেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। স্বাধীন আযরবাইজান রাষ্ট্র ঘোষণার পর রুশ সাম্রাজ্যবাদীগণ তুর্কী বিরোধী আর্মেনীয় শাউমিয়ানকে মার্কসবাদ প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, রসুলজাদা মুহাম্মাদ আমীন, তোপচিবাসী আলী মারদান, ফতেহ আলী খান, হাসান বে, ইউসুফবেলী নাসিব বে, বাগিরভ- এই সব নেতাদের সঙ্গে শাউমিয়ান এঁটে উটতে পারেনি। ফলে আর্মেনীয় সৈন্যরা মুসলিম নিধন শুরু করে। বাকু অঞ্চলে ৫০ হাজার মুসলিম নর-নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু চার মাসের মধ্যে ১০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে মুসলমানরা আবার আক্রমণ করে। ঘন ঘন কৃষক-বিদ্রোহ ও বাকুর তেল খনিতে শ্রমিক বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। কিন্তু ক্রিমিয়া ইদিল-ইউরাল ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে ১৯২০ সালের ২৭ এপ্রিল রুশ সৈন্য বাকু দখল করে নেয়। ১৯৩৮ সাল অবধি এ গুপ্ত আন্দোলনের খবর পাওয়া গেছে।

১৯৪৭ সালে কানসু-শানশী এলাকায় চীনের মুসলমানরা সাফল্যজনকভাবে কমিউনিস্ট ফৌজকে হটিয়ে দেয় ও কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে। ১৯৫০ সালে নানা ফন্দি-ফিকির করে কমিউনিস্টরা মুসলমানদের বশে আনে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২২ হাজার চীনা তুর্কীকে মেরে ফেলা হয়েছে। তুর্কিস্তানে ২০ লক্ষ চীনাকে (পরে আরও ১০ লক্ষ) এনে বসানো হয়েছে। ১৯৫৩ সালে 'জেন মিন জি পাও' পত্রিকা (১০ অক্টোবর) স্বীকার করেছে যে, মুসলমানরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। ধর্মের প্রতি অসম্মান ও শুকরের গোশত খেতে বাধ্য করার ফলে ১৯৫০-৫২ সালে এ বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। ভূমি সংস্কারের সময় হোনান প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে ও নিকৃষ্ট জমি তাঁদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। মুসলিম আচার-ব্যবহার নস্যাত করার ফলে সিয়াং চিউ, লোইয়াং ও চেং চাউ জিলায় অসন্তোষ ফেটে পড়েছে। উত্তর পশ্চিম চীনে ভূমি সংস্কারের সময়ে বিরাট সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয় (জিং লিয়াগোর বিদ্রোহ ও কাজাক বিদ্রোহ)। কানসু প্রদেশে ইয়াং চিথুন ও মা কও ইউয়ান ও সিনকিয়াং প্রদেশে ওসিংমান, চিয়া নিমুহান, য়ুতানি এরহানহাচি, সু এংতা হাপামি ও ডাঃ ইয়াওলোর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। ১৯৫০ সালে তাঁরা আইউ শহর ঘিরে ফেলেন ও চীনা কমিউনিস্টদের আক্রমণ করেন। উরুমচি দু-দুবায় মুসলিম গেরিলাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পূর্ব-তুর্কিস্তানের যুবকগণ আজও এ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

গোষ্ঠীগত কোন্দল খিভার মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। উজবেকরা তাজিকদের বিরুদ্ধে ও তুর্কমেনীয়রা উজবেক ও তাজিকদের সঙ্গে বিরোধিতা করতে থাকেন। সুবিধাবাদী জুনায়েদ খান তুর্কমান যাযাবরদের নিয়ে খান ইসফানদিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। ফলে উজবেক ও বিশেষ করে কাজাকরা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯২০ সালে জুনায়েদের অনুসারীরা তার দল পরিত্যাগ করে ও জাতীয়তাবাদী জাদীদ দলে প্রবেশ করে। লেলিনের ওয়াদার ওপর ভরসা করে তাঁরা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এ সুযোগে রুশ সৈন্য জুনাইদ খানকে অপসৃত করে ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন না করে বরং খিভা শহরকে

রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মুসলিম সংগ্রামের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো- তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যা ছিল নিতান্ত সামান্য। তাছাড়া বাইরের দুনিয়া থেকেও তাঁরা কোনও সাহায্য পাননি। তাঁদের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনাও ছিল না।

অহেতুক গোঁড়ামি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীনতা তাদেরকে নিঃশেষ করে দেয়। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতার মাঝে সুচতুর কমিউনিস্ট প্রচার খুব বেশি কার্যকরী হয়।

সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ শত চেষ্টা করেও কিন্তু মুসলমানদের স্বাভাবিক নষ্ট করতে পারেনি। মুসলমানরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে- আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান ও সর্বময় বিচারক। ফলে তাঁদের জীবনে এমন এক মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম হয়, যা দুনিয়ার বিপদ-আপদ, ঘৃণা-বিতৃষ্ণা কিছুতেই বিনষ্ট করতে পারে না। এ আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁদের সংস্কৃতি যে আজও বেঁচে আছে, এ থেকে এ-কথারই প্রমাণ মেলে। শত শত বীর এ জন্য জীবিকা, বাড়ি-ঘর-দুয়ার, পরিবার-পরিজন ও এমনকি, নিজের শেষ রক্তবিন্দু দান করে দেন। কিন্তু সবকিছুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের আপোষহীন সংগ্রাম। আজকের দিনে পারস্পরিক ঐক্য ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপরই নির্ভর করবে এ সংগ্রামের সাফল্য।

সূত্রঃ জ্ঞান বিতরণী প্রকাশিত "কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম" গ্রন্থ



হাসান জামান